উন্নয়ন ও আত্মহনন

দামোদর ভৌমিক

দৃশ্যত পৃথিবী নামক গ্রহটি সমুদ্র প্রধান হয়েও ‘ওস্‌ন্‌’ নামাঙ্কিত হয়নি, সবাই একে ‘আর্থ’ বলে। ‘আর্থ’ মানে ‘মাটি’, অর্থাৎ ‘ভূমি’ -- স্থানীয় অর্থে। আর মানুষ সহ যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ ধারণ করার জন্য ভূমি প্রয়োজন। ভূমি শুধু শস্যই উৎপাদন করে না, শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তিই ঘটায় না --- সে দৃশ্য উপহার দেয়, শ্রাব্য দেয়, ঘ্রাণ দেয়, স্পর্শ দেয়, স্বাদ দেয় -- এক কথায়, শুধু যদি মানুষের কথাই ধরি, সেএকজন ‘মানবক’ থেকে ‘মানব’ হয়ে ওঠে ‘ভূমি’ - সৌজন্যে। সমুদ্রের জল পেয়ে নয়, তা ‘ভূমি’-ই সরবরাহ করে। জঙ্গম দাঁড়িয়ে আছে ভূমির ওপরেই -- এবং স্থাবরও।

কুলগোষ্ঠীপতি কুল বা গোষ্ঠীর স্বার্থে বন কেটে জমি উদ্ধার করে তাতে সমাজ স্থাপন করলো, গ্রাম পত্তন হল, শস্যখেত তৈরি হল; সে-ই নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, রূপান্তরিত হল জোতদারে, যে বহু জমির মালিক। তার অধীনে শতাধিক পরিবার, কোথাও বা সহস্রাধিক, নিজ জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে -- ঐ জোতদারের ওপর তারা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল। বংশ পরম্পরায় তারা প্রজা এবং ব্রিটিশ আমলে তারা হল রায়ত, অকৃষি প্রজা, চাকরান, ব্রিটিশরাজের বদান্যতায়, বাৎসরিক খাজনা প্রদানের প্রায় বাধ্যতামূলক শর্তে। এই খাজনা জমিদারের অধীনে নানা জোতের মালিক অর্থাৎ জোতদারেরা তুলে দিত রায়ত - অকৃষি প্রজাদের থেকে, আর রায়ত - অকৃষি প্রজা, চাকরান, কোর্ফা, দখলকার আর ঐ জোতদারদের মধ্যে কেউ কেউ ‘জমিদার’ - পদে ‘প্রোমশন’ পেল, ব্রিটিশরাজের বদান্যতায়, বাৎসরিক খাজনা প্রদানের প্রায় বাধ্যতামূলক শর্তে। আর রায়ত - অকৃষি প্রজাদের মধ্যে যারা কিছু বেশি জমি মালিক তারা, চাকরান - কোর্ফাদের কিছু জমি বসতে দিয়ে বিনিময়ে সারা বছরই বিনা মূল্যে শ্রম পেত তাদের কাছ থেকে, দৈনন্দিন যে শ্রমের সাহায্য ছাড়া জমিঅলাদের প্রাত্যহিক জীবন অচল। এভাবেই উদ্ভব ঘটেছিল নাপিত, জোলা, জেলে, মুচি, মেথর, মাঝি, চাকর, বেহারা, পাল্কীবাহক, দৌবারিক, কামার, কুমোর ইত্যাদি তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের। একই সঙ্গে ঈষৎ মর্যাদা দিয়ে জমিঅলারা তৈরি করে নিয়েছিল নায়েব, গোমস্তা, মোসায়েব, বিদূষক, সভাকবি, পুরোহিত, পাইক, বরকন্দাজ, লেঠেল।

ব্রিটিশের আগে ইসলাম সভ্যতায় বা তার আগের হিন্দু যুগে বা তারও আগের সভ্যতাগুলিতে এসব বিভাজন, নানা সম্প্রদায়ে মিশ্রভাবে যে ছিলনা তা বলা যায় না। তবে সেগুলি লিখিত আইনের বইয়ে জায়গা পেল কিছুটা ইসলাম যুগে, পরে ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশ করলো বেঙ্গল টেনান্সিএক্ট হয়ে ‘এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট’ --এ অর্থাৎ ‘জমিদারী গ্রহণ আইনে’। এই প্রথম একজন রায়ত, তারপরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন, ২৫ একরের বেশি কৃষিজমি রাখতে পারবে না; কিন্তু বাগান, পুকুরও বাদবাকি অকৃষি জমি যত খুশি রাখতে পারবে না; কিন্তু বাগান, পুকুর ওবাদবাকি অকৃষি জমি যত খুশি রাখতে পারবে। এই আইন প্রবর্তিত হল স্বাধীনতার পর, পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৫৩ সালে। পরে ১৯৫৬ সালের ১০ই এপ্রিলে ‘ই.এ. অ্যাক্ট’ -এ ‘চ্যাপটার সিক্স’ অন্তর্ভুক্ত হয়, যাতে সরকার ওরায়তদের মধ্যে অবস্থানকারী জমিদার অর্থৎ মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষিজমি ২৫ একর ও অকৃষি জমি ১৫ একরের বেশি রাখতে পারবেন ।বলা হয়। এই আইনের ৬ ধারায় এই ঊর্ধসীমা নির্দিষ্ট করার পর সরকারে বর্তানো জমি বাঁচাতে ঐ সময়, বিশেষত ২৪ পরগণায়, উত্তর ও দক্ষিণ, দুই অংশেই বহু ধানী জমি লবণাক্ত নদী জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা কৃষিজমির সংজ্ঞা হারায় ও উধর্বসীমার আওতার বাইরে থাকতে পারে।

তবুও ঐ আইনে বহু কৃষি ও অকৃষি জমি সরকারে খাস হতে পেরেছিল, অনস্বীকার্য। পরবর্তী কালে, 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৫৫') ১৯৭১ -এ একবার, ১৯৮১ ও ১৯৮৬ - তে আরো দু'বার 'মডিফাইড' (সংশোধিত) হয়ে এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সব জমিই (কৃষি ও অকৃষি, এমননি পুকুর, ডোবা, ভেড়ি সমেত) জমি এবং একজন রায়ত (এখন 'অকৃষি প্রজা' বলে কিছু নেই) এই আইনের ১৪-এম ধারায় নির্ধারিত ঊর্ধসীমা মেনেই জমি রাখতে পারবে, তার বসত বাড়ি সহ।

এই ধারায় বলা হয়েছে একজন রায়ত - বিশিষ্ট পরিবার সর্বাধিক ২.৫ স্টান্ডার্ড হেক্টর পরিমাণ জমি, দুই থেকে পাঁচ জনের পরিবার সর্বাধিক ৫.০০ স্টান্ডার্ড হেক্টর পরিমাণ জমি, পাঁচের বেশি হলে মাথাপিছু ০.৫০ স্টান্ডার্ড হেক্টর হিসেবে, নয় বা তার বেশি সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট রায়তী পরিবার সর্বাধিক ৭.০০ স্টান্ডার্ড হেক্টর পরিমাণ জমি নিজ মালিকানায় রাখতে পারবে। কোন ক্ষেত্রেই একটি রায়তী পরিবার ৭.০০ স্টান্ডার্ড হেক্টরের বেশি জমি রাখার অধিকারী নয়।

সেচ এলাকায় ১.০০ স্টান্ডার্ড হেক্টর =২.৪৮ একর বা ৭.৫১ বিঘা।

অসেচ এলাকায় ১.০০ স্টান্ডার্ড =৩.৪৭২ একর বা ১০.৫২ বিঘা। এই হিসেবে সেচ এলাকায় রায়তের পরিবার যদি ১ সদস্য বিশিষ্ট হয়, তবে ৬.২ একর বা ১৮.৭৮ বিঘা জমি রাখতে পারে; অসেচ এলাকায় তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৮.৬৮ একর বা ২৬.৩০ বিঘা। ২ থেকে ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট রায়তী পরিবার সেচ এলাকায় ১২.৪ একর বা ৩৭.৫৮ বিঘা জমি এবং অসেচ এলাকায় ১৯.৩৬ একর বা ৫২.০৬ বিঘা জমি রাখার অধিকারী। বাড়তি প্রতি সদস্যের জন্য সেচ এলাকায় ১.২৪ একর বা ৩.৭৫ বিঘা ও অসেচ এলাকায় ১.৭৩৬ একর বা ৫.২৬ বিঘা জমি ধরলে সর্বাধিক নয় বা ততোধিক সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট রায়তী পরিবার মোট ১৭.৩৬ একর বা ৫২.০৬ বিঘা (সেচ এলাকায়) অথবা ২৪.৩০৪ একর বা ৭৩.৬৫ বিঘা (অসেচ এলাকায়) পরিমাণ জমি রাখতে পারবে। এ ছাড়াও 'আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট' ও 'ই. এ. অ্যাক্ট' - এর ৬ (৩) ধারায় ১৯৫৫ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমি রাখার আলাদা আইন বলবৎ আছে। 'ইউ. এল. সি. অ্যাক্ট' - এ শহরাঞ্চলে বাস্তু জমি (বসত বাড়ি ও সংলগ্ন জমি) হিসেবে মোটামুটি সাড়ে সাত কাটা জমি রাখা যায়। এখানে পরিবারের সদস্য সংখ্যার তেমন কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই।

সংশোধনী সহ 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন' কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা (যাদবপুর, সাউথ সুবার্বন বা গার্ডেনরিচ পৌর এলাকা, যা পরবর্তী কালে কলকাতা কর্পোরেশনভুক্ত হয়েছে, তা বাদে) এবং উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত চা বাগান এলাকা বাদে বাকি পশ্চিমবঙ্গেসমভাবে প্রযোজ্য। এই আইনের মূল ধারাগুলি ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগেই আইনে পরিণত হলেও যুক্তফ্রন্ট আমলে কিছু কাজ হওয়া ব্যতীত পর্ববর্তী কংগ্রেসী শাসনে সেভাবে কার্যকরী হয় নি। মূলত ১৯৭৭ সালের পর থেকে আজ পর থেকে আজ পর্যন্ত ২৮ বছরে বহু কৃষি - অকৃষি জমি পঞ্চায়েত ও পৌর এলাকায় সরকারে ন্যস্ত হয়েছে এবং তা বহু সংখ্যক ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে পঞ্চায়েত এলাকায়। পৌর এলাকায় সরকারে ন্যস্ত জমি আইন মোতাবেক স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী লিজে বন্দোবস্ত দেওয়ার আইনী ব্যবস্থা আছে।

এ পর্যন্ত 'জমিদারী গ্রহণ আইন', 'ভূমি সংস্কার আইন' ও শহরাঞ্চলে বাস্তু জমি ও কারখানা জমির উর্ধসীমা সম্পর্কিত আইনগুলির কথা সাধারণ ভাবে বোঝার জন্য বলা গেল। এইসব আইনে কত পরিমাণ কৃষি বা অকৃষি জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে এবং তার কতটুকু ভূমিহীন কৃষিজীবীদের মধ্যে পাট্টা বিলি করা হয়েছে বা স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী লিজের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার আলাদ 'স্ট্যাটিসটিকস' লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন দেখি না, কেননা বিলি করা বা লিজ দেওয়া কৃষি বা অকৃষি জমি পাট্টাদার বা লিজ গ্রহীতা কতদিন নিজ দখলে বা মালিকানায় রাখতে পেরেছে এবং এই ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার সত্যি সফলকাম হতে পেরেছে কিনা, অতঃপর সেটুকু বিচার্য।

ভূমি সংস্কারের সাফল্য নির্ভর গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্টের একচ্ছত্রাধিপত্য একেবারে বিনা কারণে নয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পঞ্চায়েতগুলির ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া। জমিকে কেন্দ্র করে, বিশেষত চাষের জমি, গ্রামাঞ্চলে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনযুক্তফ্রন্ট সরকার (১৯৬৭) আসার পরই ক্রমশ বাড়তে থাকে। 'লাঙল যার জমি তার' এই যুক্তিতে বহু খাস জমি ও বেনামি জমি (জোতদারের দখলে থাকা) রাজনীতি করা বা না - করা কৃষিজীবী মানুষ দখল করে নিতে থাকে ঐ ১৯৬৭-র পর থেকেই, যাদের একাংশ আবার ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ -এর কংগ্রেসী শাসন পর্বে দখলচ্যুত হয়।

১৯৭৭ - এর পর তারা ধীরে ধীরে পাট্টা পাওয়ার মাধ্যমে এসব জমির দখলও মালিকানা পায় এবং এদের সঙ্গে আরো অসংখ্য ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষ যুক্ত হয় নতুন পাট্টাদার হিসেবে। মোটামুটি১৯৮২ সাল পর্যন্ত এই পাট্টাদার নির্বাচন প্রক্রিয়াটা যথার্থভাবেই হচ্ছিল; কিন্তু ততদিনে, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরথেকেই ক্রমশ ক্ষমতাশালী মানুষেরা ক্ষমতাস্বরূপ মধুস্বাদ টের পাওয়ার পর থেকেই পাট্টা বিলি প্রক্রিয়ায় জল মেশানো শুহতে লাগলো। এক্ষেত্রে বেছে বেছে ক্ষমতাসীন দলের নিজ মতাবলম্বী তো বটেই, এমনকি প্রকৃত ভূমিহীন কৃষিজীবী নয়, এমন মানুষও পাট্টা পেতে শু করলো। আইনের ৪৯ (১ক) ধারায় পাট্টা প্রাপ্ত জমি অন্ততপক্ষে ১০ বছরের মধ্যে হস্তান্তর বা বন্ধকী করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেছে ২-৪ বছরের মধ্যেই বহু পাট্টাদার, নানা কারণে, পাট্টাপ্রাপ্ত জমিটুকু হয় হস্তান্তর করেছে অথবা বন্ধক দিয়েছে বা লিজ দিয়েছে। এবাবে হাত বদল হওয়া জমি অনেক ক্ষেত্রেই তার কৃষি চরিত্র হারিয়ে ছোট ছোট কারখানায় বা পুকুরে বা ভেড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষ চিরকালীন কৃষি মজুর বা কৃষি দাস দশা থেকে উদ্ধারপেয়ে নিজ কৃষি জমির মালিক হতে পারে এবং নিজ পরিবারকে নিজ কৃষি উৎপাদিত ফসলের আয় থেকে প্রতিপালন করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে।তা না হয়ে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল ঐসব ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষ পাট্টা জমি ধরে না রাখতে পেরে পুনর্মুষিক ভব অর্থাৎ কৃষি মজুর বা কৃষি দাস দশায় ফিরে গেছে। কেন এমনটা হল?

এমন হওয়ার প্রধানতম কারণ মূলত ভূমিহীন কৃষিজীবী মানুষদের নিজ পায়ে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। ভূমি সংস্কার দপ্তরের পাশাপাশি কৃষি, সেচ, স্বরাষ্ট্র, গ্রামোন্নয়ন ও অর্থ দপ্তরগুলিকে সমানভাবে সক্রিয় করার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। পাট্টা প্রাপক অনেক ঝঞ্ঝাটের পর এক - দেড় - দুই বা আড়াই বিঘা (কোথাও তারও কম) চাষের জমির দখল পেয়ে দেখলো তাকে চাষ করতে হলে এখনই লাঙল, বীজ, সার, সেচ, কীট নাশক জোগাড় করে জমিতে নামতে হবে, নয়তো কিছুই উৎপন্ন করা যাবে না। পঞ্চায়েতে গেল সে, কৃষি দপ্তরে গেল সে, সেচ দপ্তরে গেল, এমনকি ব্যাঙ্কেও গেল, যদি পাট্টা দেখিয়ে কিছু পায় -- সার বা বীজ বা অর্থ সাহায্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তেমন কিছু পেল না সে, বা যদিও পেল, যতটুকু পেল, তার একটা নির্দিষ্ট অংশ কমিশন খেয়ে নিল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা এবং সরকারি কর্মচারীরা। অগত্যা এবার সে হাত পাতলো গ্রামীণ মহাজনের কাছে, যে তাকে কিভাবে দুইয়ে খেয়ে নিতে হবে, সেই চিরকালীন আদিম কৌশল ভালোভাবেই জানে। সুতরাং পাট্টাদার তার স্বল্পপরিমাণ জমির মালিকানা স্বত্ত্বটুকু ঋণদাতার কাছে বন্ধকে গচ্ছিত রেখে ফসল উৎপাদনের কাজে নামতে বাধ্য হল, কেননা সরকার তাকে জমি দিয়েছেন চাষ করার জন্য এবং পর পর তিন বছর চাষ না করলে এবং তার উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলে আইন মতো পাট্টা বাতিল হতে পারে এই ভয়ে সে চাষের কাজে নামতে বাধ্য হল। এখনও সর্বত্র সেচের সুবিধে নেই, সার ও কীট নাশকের দাম ঊর্ধ্বমুখী, ফলত চাষের ব্যয়ও লাগাম ছাড়া; অথচ সর্বত্র সর্বদা উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য ফেরৎ পাচ্ছে চাষি, এ সম্ভাবনা তীব্র অনিশ্চয়ে ভরা। এসবের মিলিত ফলোদয় এই যে পাট্টাদার দু'চার বছর পরই মহাজনের ঋণ শোধে অপারগ ও অবশেষে জমি হাতছাড়া হয়ে সে পুনরায় কৃষি দাশে পরিণত। অথচ সরকার যদি এসব খাস জমি বিলি করার আগে পাট্টা প্রাপক কৃষিজীবী মানুষটি যেন জমির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সার - বীজ - লাঙল - সেচ - কীট নাশক পায় এবং অন্তত প্রথম কয়েক বছর এই সুবিধে পেতে পারে, সঙ্গে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য লাভজনক মূল্য, এমন সুসংহত পরিকল্পনা নিয়ে এই কাজে নামতেন, তাহলে ভূমি সংস্কারের প্রত্যক্ষ সুফল মিলত। এই সঙ্গে বর্গাদারদের কথাও বলা প্রয়োজন। বহু জমিঅলা মানুষ স্বীয় ক্ষমতায় চাষাবাদ করতে পারে না; তাঁরা বর্গাদারদের মাধ্যমে জমির কৃষিকর্ম বহাল রাখেন। এসব বর্গাদারের নাম সরকারি খতিয়ানে সেভাবে নথিভুক্ত হয়েছিল, যাদের একাংশ মিথ্যে বর্গাদারও ছিল। যে বিধবা বা বেকার অল্প পরিমাণ জমির মালিক, সেই জমি চাষ করতে এবং বর্গাদারও তার নাম নথিভুক্ত করেছিলেন; যে কারণে ঐ বিধবা বা বেকার যে কোন জাগতিক প্রয়োজনে ঐ জমি কম দামে হয় বর্গাদারকে অথবা অন্য কাউকে বেচতে বাধ্য হয়েছে।

এখন পাট্টাদারদের তুলনায় বর্গাদাররা কিছুটা ভাগ্যবান। বর্গাদার শ্রম ব্যতীত জমির পেছনে আর কিছু ব্যয় না করলে উৎপাদিতফসলের অর্ধেক পরিমাণ পেতে (আইনত) পারে, রসিদের বিনিময়ে; এছাড়াও প্রথমে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে জমি বেচতেও পারবেনা মালিক, যদি সে জমি কেনার ক্ষমতা রাখে। এছাড়ও ব্যাঙ্ক লোন পাওয়ার ক্ষেত্রেও বর্গাদাররা

অনেক সময়েই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, কেন তা বোঝা মুস্কিল। আরো কিছু মানুষ উপকৃত হয়েছিল 'বাস্তু জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৮' সফল ভাবে রূপায়িত হয়ে। এই আইনে বলা হয়েছে জোতদার বা জমিঅলার যে কোন জমিতে কোন 'আর্টিজান' বা 'কারিগর - কাকর্মী' পরিবার, যার ভূ-ভারতে এক ছিটে জমি নেই কোথাও, থাকার জন্য বসত বাড়ি তৈরি করে বেশ কিছু দিন বসবাস করছে, সর্বাধিক পাঁচ কাঠা পর্যন্ত, তা সরকার অধিগ্রহণ করে ঐ পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীর নামে মালিকানা স্বত্ত্ব দিয়ে দেবে। কারিগররা, যেমন তাঁতী, জেলে, কামার, কুমোর, চাষীথেকে শু করে সমগোত্রীয় প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ই, প্রকৃত ভূমিহীন, তারা ১৯৭৮ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যায়, পশ্চিমবঙ্গে, অন্তত নিজ ব াস্তুর মালিক হয়েছে এবং এই কাজে সর্বাধিক সাফল্য এসেছে বাম আমলে। কেননা, কৃষি জমি হস্তান্তর হলেও সাধারণ ম ানুষ সাধারণত বাস্তুটুকু খোয়াতে চায় না, মাথার ছাদ কেউ বা হারাতে চায় না, টিজি তবু মোট বয়েও জোটানো যায় কিন্তু রাতে তো একটু ঘুম প্রয়োজন, আর তাই ঘর হাতছাড়া করা যায় না, নেহাৎ নিপায় না হলে। তাই 'বাস্তুপ্রাপক' অসংখ্য ভূমিহীন কাজীবী, শুধুমাত্র পঞ্চায়েত এলাকাতেই অন্তত ঘরটুকু পেয়েছে, এটা কম সাফল্য বলে মনে করি না।
তবে এক্ষেত্রে যে রাজনীতি বা দুর্নীতি হয়নি, তা বলা যায় না। অযোগ্য কিছু মানুষ, যে প্রকৃত ভূমিহীন বা কাজীবী নয়, এমন মানুষও বাস্তুজমি পেয়ে গেছে; তবে এক্ষেত্রে সংখ্যাটা অনেক কম, অন্তত পাট্টা বা বর্গাদারদের ক্ষেত্রের বিচারে।
এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জমির পরিমাণ ত্রমশ কমে যাওয়ার তীব্র সমস্যা। চাষবাস যদি লাভজনক না হয়, কেন চাষি ফসল ফলাবে? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এই পেশা, চাষি আর কতদিন বাধ্য হবে নেশার ঘোরে চাষকরায়? পেটে খিল মেরে, ঘরের ছেলেমেয়েগুলোকে স্কুল ছাড়িয়ে, স্ত্রীকে গতর খাটুনির (সর্ব অর্থে) কাজে পাঠিয়ে, নদীগর্ভে পিতৃপুষের বাড়ি - জমি - বাগান - পুকুর সহ সর্বস্ব তলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে কি সে ভিখা রি হয়ে যাবে ত্রমশ? আবার দেনা করে সে চেষ্টা করবে কিছুটা সংগ্রহ করার, আর যদি তা না সম্ভব হয়, সে সম্পন্ন কৃষি পরিবারে কৃষি মজুরের কাজ নেবে, চাষই করতে থাকবে সে, অন্য পেশা নেবে না, তা কি হয় এরপর?
অন্য পেশায় চলে যাওয়া কৃষিজীবী মানুষ, ইতিমধ্যে অন্য পেশায় থাকা অসংখ্য মানুষ এবং এখনো থেকে যাওয়া অসংখ্য কৃষিজীবী মানুষ সকলেরই বাঁচতে হলে দুটি জিনিস কম করে প্রয়োজন, খাদ্য, পরে আশ্রয়। কৃষি জমির পরিমাণ যদি কমে, কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা যদি কমে, তবে ফসলও কম ফলবে এবং খুব দ্রুত অবস্থার অবনতি হয়ে মন্বন্তর দেখা দেবে। এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য অবিলম্বে চাষের জমি বাঁচাতে হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা অসংখ্য মানুষকেও বাঁচাতে হবে। সুচা পরিকল্পনা করেই তা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, প্রত্যেক সাধারণ মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত হতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে ফসল উৎপাদক মানুষদের প্রতি। প্রায় নির্দ্বিধায় আমরা কম বেশি যে চা ষিকে তার ফসলের দাম কমিয়ে দিতে চাই, একথা অনস্বীকার্য,এই মনোভাব প্রথমেই পাল্টে ফেলতে হবে, ভাবতে হবে ওকে যদি শাক আঁটির দাম ২৫ পয়সাও কম দিই, ও ত্রমশ গরিব হবে। ওকে বাঁচাতে হবে ওর জন্য ও নিজের জন্য, উভয়েরই জন্য, নয়তো অন্য পেশায় চলে যাবে, আর ওদের কাছে বেচতে না পেরে চাষি আরো কম দামে মহাজন ও ফড়েদের কাছে বেচবে, তার সম্বৎসরের ব্যয় তার আয়ের তুলনায় বাড়তেই থাকবে। এসব ভেবে, কৃষি জমি ও কৃষিজীবী উভয়কেই বাঁচ ানো এখনই প্রয়োজন, সার্বিক পরিকল্পনা নিয়েই, নয়তো ধবংস অনিবার্য।
তবে কি রাস্তাঘাট চওড়া করা বা তৈরি করা বা কলকারখানা - অফিস ঘর - দোকানপাট - বাড়িঘর - রঙ্গমঞ্চ - পার্ক এসব বানানো বন্ধ থাকবে? অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী বা প্রতিবেশী রাজ্যের ত্রমশ আসতে থাকা মানুষ, যারা পশ্চিমবঙ্গে র বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে জায়গা নিচ্ছে, ত্রমশ জনাকীর্ণ হয়ে পড়া এত মানুষ থাকবে কোথায় বা কর্ম সংস্থানই বা হবে কি করে?
এই সঙ্গে কমছে গাছপালা ও জলাভূমির পরিমাণ। কত জলাভূমি, নদী বুজিয়ে শহর - গঞ্জ - ইটভাটা তৈরি হয়েছে তার হিসেবে নেই, সত্যি অর্থেও জমির রেকর্ডে দীর্ঘকালের নদী বা পুকুর বা জলকর কেটে বাস্তু কারখানা ইত্যাদি লেখা যায় না চট করে, রেকর্ডে প্রায় ক্ষেত্রেই পুরনো শ্রেণীটিই লেখা থাকে; কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করলে জলাভূমি বা পুকুর - ডে াবার বদলে সেখানে হয় সিনেমা হহল, নয়তো ফ্ল্যাট বাড়ি অথবা অন্য কিছু বর্তমান দেখা যায়। হিসেব প্রকৃত ছবি দেবে ন া, দেবে সরেজমিন তদন্ত। দেবে নতুন করে মানচিত্র তৈরির কর্মকাণ্ড, তবেই সত্যি কতটা জলাভূমি বা কতটা কৃষি জমি পড়ে আছে, কটা বাগান অক্ষত আছে, সেই ছবিটা মিলবে। 'রেকর্ড অব রাইট্স'ও প্রায় একই দশা প্রাপ্ত। 'কম্পুটার

াইজেশন' - এর পর এটা বেড়েছে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতে লেখা জমি রেকর্ড থেকে কম্পুটারে নাম - ধাম - খতিয়ান - দাগ নং - জমির শ্রেণী - অংশ পরিমাণ যথাযথভাবে তোলার কাজটা করানো হয়েছে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত বেসরকারি 'ভেন্ডার'দের দিয়ে। তত্ত্বাবধান ও যাঁচের কাজটা সরকারি কর্মী - আধিকারিকরা করলেও সেখানে দৈনন্দিন জমি সংক্রান্ত হাজারো কাজের পাহাড় সামলে তাদের করতে হয়েছে, ফলত বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত ছবি অস্পষ্ট।

তাহলে জলাশয় কমছে, মাছ কমছে, কীটপতঙ্গ - পাখি - জলজ উদ্ভিদ কমছে এবং গাছ কমছে, তাহলে বেড়ে চলেছে কেবল মানুষ কারা ভোগ করবে বসুন্ধরা, যদি বসুন্ধরাই না থাকে?

সেদিন ঘটনাচক্রে চাকদহ থেকে বনগ্রাম গিয়েছিলাম বাসে চেপে। শিলিন্দা বেলে পেরনোর পরই দেখছিলাম রাস্তার ডান পাশে,কখনো বা বাঁ পাশেও মোটা মোটা বট অশ্বত্থ বা এমন আরো বহু পুরনো গাছগুলি গুঁড়ি ঘেঁসে কেটে ফেলা হয়েছে, পর পর, কিলো মিটারের পর কিলো মিটার, স মোটা সব গাছ, কখনো ডানে, কখনো বাঁয়ে, ঝাড়ে বংশে কেটে ফেলা হয়েছে, কোথাও তা বাস রাস্তার ধারে ধারেই, কোথাও রাস্তার সিকি অংশ জুড়ে পড়ে রয়েছে, এখনো সরানোর ফুরসত পাওয়া যায় নি। গোপাল নগরের পর থেকে শু হল আরো মর্মান্তিক দৃশ্য। এবার বট অশ্বত্থের মতো মামুলি বৃক্ষ নয়, কয়েক শত বছর বয়সী মহাদ্রুম শিশু গাছগুলি, যা চাকদহ -বনগ্রাম রোড ও যশোর রোডের গর্ব বলা যায়, সেগুলি সমূলে ধরাশায়ী, একের পর এক, প্রায় তিন - চতুর্থাংশ আয়ুও হাতে গোনা কটা দিন। যে অনুষ্ঠানে যেতে হয়েছিল, তা অচিরেই বিস্বাদ হয়ে গেল এই দৃশ্যে, শুনলাম ঢাকা - কলকাতা টের মহার্ঘ বাসগুলি অপরিসর যশোর রোড দিয়ে যেতে যেতে এতদিনে আন্তর্জাতিক লজ্জার ভাণ্ডার প্রায় পরিপূর্ণ, তাই চাকদহ - বনগ্রাম রোডটিকে চওড়া করেবাসগুলিকে এন. এইচ. ৩৪ ধরিয়ে কলকাতা পাঠানো হবে। সুতরাং দেশের গর্ব ও মহামূল্যবান সম্পদ, তা শিশু গাছ বা যা খুশি হোক, কেটে সাফ করে দিতে হবে, এতে আন্তর্জাতিক লজ্জা কমবে না বাড়বে, এ কথা কেউ ভাবল না, মানে ভাবনা করার মতো একটি মাথাও ছিল না এই পোড়া পশ্চিমবঙ্গে।

আচ্ছা, রাস্তার দুইপাশে গাছের গোড়াগুলি থেকে এক ফুট দূরত্ব আগে পর্যন্ত বাড়ানো যেত না? সর্বত্র যদি তা সম্ভব নাও হতো, তাহলে গাছগুলির অস্তিত্ব বজায় রেখে, বাঁ বা ডান পাশ দিয়ে আরো একটি সম প্রস্থের নতুন রাস্তা বানানো যেত না? তাতে হয়তো গাছগুলির পাশ বরাবর নয়ানজুলি - ডোবা - পুকুরের একাংশ, কিছু চাষের জমি - ঘরবাড়ি- দোকানপাট - হাটবাজার অধিগ্রহণ করতে হতো, যা স্থানান্তকরণযোগ্য, অন্যত্র ঘরবাড়ি - দোকানবাজার তুলে নেওয়া যায়, কিন্তু ঐ মহাদ্রুমগুলি, যা শুধু শোভাবর্ধকই নয়, দেশেরপ্রাণ ও প্রকৃতির মর্যাদা বাহক, দূষণ রোধকারী, শত সহস্র পাখি ও কাঠবেড়ালির আশ্রয়দাতা, সেগুলি বেঁচে যেত, শুধু বেঁচে যেত না,দুই 'লেন' -এর পাশাপাশি রাস্তায় গাড়িগুলি আরো মসৃণ ছুটত, আপ ও ডাউনে আলাদা ছোটায় দুর্ঘটনা অনেক কম ঘটতো, সর্বোপরিপ্রকৃত উন্নয়ন ঘটতো মানসিকভাবেও, এই দেশের মানুষের।

এটা ভাবা হয়েছে কিনা জানা নেই, যদি ভাবা হয়েও থাকে, তবে মহাদ্রুম মহীহগুলির মাংসল শরীরগুলির প্রতি আজন্ম লোভী কাঠ ব্যবসায়ীদের চক্রের চাহিদাই বেশি বিবেচ্য হয়েছে এই দেশের শাসক সম্প্রদায়ের কাছে, যেখানে 'বিবেচনা' শব্দটিই শেষ পর্যন্তহাস্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এটাও এই সঙ্গে আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা কোন সংবাদপত্র বা সংস্থা বা সংগঠন বা টি.ভি. চ্যানেল চাকদহ - বনগ্রাম রোডের এই নৃশংস অমানবিক অসভ্যতা দ্যোতক ভয়াবহ বৃক্ষচ্ছেদনের বিদ্ধে প্রায় কোন প্রতিবাদ বা প্রতিবেদন পেশ বা আন্দোলন, কিছুই তেমন করেন নি, করলে হয়তো এত সহজে এই মহা সর্বনাশ ঘটে যেত না গত কয়েক মাসে, কলকাতার এত কাছে, প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালেই এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। পশ্চিমবঙ্গবাসী জানলো না, তারা কি হারালো!

তো, এমন অনেক অনেক প্রকৃতিজ এবং সর্বোপরি ভূমিজ সম্পপদ হারাতে হারাতে আমরা তো খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বদলে কি পাচ্ছি আত্মধবংসী মানবতা, যা রাষ্ট্রের ইচ্ছা মতো চালিত হচ্ছে, ব্যক্তির কথা ভাবা হচ্ছে না, রাষ্ট্র একটা স্বয়ং সংজ্ঞায়িত সংস্থা, যার অনধিকার প্রয়োগও অধিকার নেই এসব যথেচ্ছ ভাবে ধবংস করার সংস্থার পক্ষে উচিত সিদ্ধান্ত হবে ইট - কাঠ - কাঁচ - পাথর - পিচ - খোয়া - লোহা - নাটবল্টু দিয়ে একটা বিরাট এলাকায় উন্নয়ণ ও কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগে অনুর্বর অঞ্চলকে কাজে লাগানো, কেননা কৃষি জমি কমলে যেটুকু খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে, সেটুকু কারখানায় ফলানো যাবে না। যখন আমরা দেখছি, জনসংখ্যাক্রমশ বর্ধমান, অথচ ফসল উৎপাদন কমতির দিকে,

তখন যে কোন মূল্যে অবশিষ্ট কৃষি ও বন সম্পদকে রক্ষা করাই হবে প্রকৃত মানবতা, নচেৎ আগামী দিনে ঝাঁ - চকচকে মড়ক অনিবার্য।

যদি প্রা ও ঠে পাণ্ডব বর্জিত জেলাগুলিকে প্রান্ত কলকাতা বিমান ও সমুদ্র বন্দর থেকে দূরে হলে প্রকল্প ব্যয় তো বাড়বে। ব্যয় তো বাড়বেই, আরেকটা বিমান বন্দর বাঁকুড়াতেই হোক না, আর পুলিয়ায় হোক প্রকল্প। যদি তা সম্ভব না হয়, ত াহলে হল্যান্ডবাসীরাও কখনো এমন উদ্যোগ নিত না, যাতে তারা সমুদ্রগর্ভ থেকে কৃষি জমিউদ্ধার করে ফসল ফলাতে ও বাসযোগ্য জনপদ গড়ে নিতে পেরেছে।

শিল্পায়ন হোক, প্রত্যেক মানুষ তা চায়, কিন্তু অবাস্তবভাবে অনধিকারভুক্ত কাজের মধ্য দিয়ে নয়, একথা সরকারি বেসরকা রি সবসংস্থাকেই বুঝতে ও ভাবতে হবে। অনধিকারভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হল উপকারীকে হত্যা করা। গাছ, জল, হাওয়া, উর্বর মাটি, নদী, পুকুর, এরা সকলেই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের, এদের রক্ষা করেই উন্নয়ন সম্ভব বা উন্নয়ন যদি করতেই হয় অনধিকারভুক্ত বিষয়ে নাক না গলিয়েই করতে হবে, এমন একটা কড়া আইনের প্রবর্তন আশু জরি।

ভূমি সম্পদ যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। আর জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে, জল সম্পদের ক্ষয়বৃত্তি যুক্ত নূতনসমস্যার রূপে। ভূতলে প্রথম পেয়ে জলস্তরে বৃষ্টির জল জমা হয়, যা বছরে বছরে ক্ষয়পূরণ হয় মৌসুমী ঋতুর সৌজন্যে, সঙ্গে যুক্ত অতি দূষণে মৌসুমী জলবায়ুও ক্ষয়িষ্ণু বা অসময়ে জাত হয়ে প্রলয়ঙ্করী। এই জল পুনর্ব্যবহার যোগ্য। কিন্তু পরে পেয় জলস্তরটি অছিদ্র দুই প্লেট পাথুরে ভূস্তরের মধ্যে জমাকৃত, আদিম যুগে জাত হয়ে প্রলয়ঙ্করী। এই জল পুনর্ব্যবহার যোগ্য। কিন্তু পরে পেয় জলস্তরটি আদিম যুগে জাত পৃথিবীর গর্ভকেন্দ্র থেকে যুগে যুগে তাপ হারাতে হারাতে যা পৃথিবীর সম্পদ, ফলত রাজ্যেরও সম্পদ। অসংখ্য বহুতল বাসিন্দার চাহিদা মেটাতে সেই আদিম জলস্তরটি ইতিমধ্যেই ক্ষয়িষ্ণু হতে শু করেছে গভীর নলকূপে তোলার মাধ্যমে, যে জলস্তরবৃষ্টির জলে পূরণের সম্ভাবনা খুবই কম, আর যে জলের চাপ কমে ঐ ভূস্তরে, সেই পাথুরে প্লেটটি দুর্বল প্লেটে প্রবল সংঘাত, মহাদেশের সরণ, সুনামি, সামুদ্রিক ক্যাটারিন া, প্লাবন, জীবন ও সম্পদ ধবংস।

এর একমাত্র সমাধান অফুরন্ত সমুদ্র জলকে পেয় করে তোলার আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যাপক ভাবে কাজে লাগানো, না হলে এত বাড়িঘর - কারখানার ব্যবহার্য এত প্রচুর ও সর্বদা বাড়তি জলের চাহিদা মিটবে কি করে? এজন্য মানষকে পেয় জল পেতে হলে সমুদ্র জল থেকে, নচেৎ অচিরেই শুধুমাত্র পেয় ও ব্যবহার যোগ্য জলের জন্য আবার একটি বা একাধিক যুদ্ধ শু হয়ে যাবে, যার পরিণতি সমূলে বিনাশ।

সভ্যতা নির্মিত হচ্ছে, কারণ কোন কিছু নির্মাণ মানেই কারিগরী শিল্প, যা মানুষের কল্যাণ করবে ভেবেই করা, তা যাতে সহজে ধবংস হতে পারে, এই প্রবণতাকে ঠেকাতে পারছে না মানুষ তাই জল ও ভূমির এই মহাক্ষয় চলছেই, ভবিতব্য তীব্র অনিশ্চয়ে ভরপুর এবং বর্তমানের প্রাপ্তিতেই তৃপ্ত থাকার সর্বনাশী স্থবিরতা মারাত্মক হয়ে উঠেছে, এই দোষ কাটিয়েই উঠতে হবে মানুষকে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com